সে চলে গেলো বলে গেলো না

কাইউম পারভেজ

হক ভাই অর্থাৎ ড. আব্দুল হক ভাইকে চেনেন না বা নাম শোনেননি এমন মানুষ এ শহরে খুঁজে পাওয়া একটু দুস্করই হবে বৈকি। আমারও তাঁর সাথে চেনা জানা সেই বিরানব্বই-তিরানব্বইয়ের দিকে। তখন আমরা বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েসন অব নিউ সাউথ ওয়েলস্ নিয়ে বেশী মেতে থাকতাম। নানান অনুষ্ঠানের মহড়া চলতো ওখানে। হক ভাইকে ভাবিসহ নিয়মিত দেখতাম ওখানে - সঙ্গে মেয়ে সাথী এবং ছেলে রানা। এভাবে তাঁর সাথে আমার পরিচয়। হক ভাই নানা ভাবে এ্যাসোসিয়েসনকে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। ক্রমেই বুঝলাম কাজ পাগল এ মানুষটার কাজই যেন খুঁজে খুঁজে কাজ বের করা।

এরপর হঠাৎ একদিন ফোন করে বললেন - সন্ধ্যায় আমার রেস্টুরেন্টে (বে অব বেঙ্গল, ব্লাকটাউন) চলে আসেন আপনার সাথে জরুরী কথা আছে। গেলাম ওখানে। দেখলাম এমনিভাবে আরো এসেছেন সিরাজুস সালেকীন, আতিক হেলাল, আবদুল্লাহ আল মামুন, আনোয়ার আকাশসহ আরো পরিচিত দু' একজন। সবাই এলে হক ভাই বললেন - আমাকে ক্যান্সার কাউন্সিল থেকে উৎসাহ দিচ্ছে তাদের তহবিল সংগ্রহে মর্ণিং ব্রেকফাস্টের আয়োজন করতে। আমরা এদেশে থাকি এদের সাথে মিশে আমাদের কম্যুনিটির জন্য কিছু করা উচিত। এতে করে আমরা ওদের কম্যুনিটিতে সম্পৃক্ত হলাম আবার নিজের দেশের পরিচিতিটাও দিয়ে দিলাম। আর ক্যান্সার গবেষণায় আমাদেরও কিছু অবদান থাকুক। আপনারা রাজি হলে আমি কাউন্সিলের কাছ থেকে ওদের লাগোয়া

পার্কটাকে ব্যবহারের জন্য চাইবো আমার মনে হয় ওরা অমত করবে না। আমরা সবাই একমত এটা করতে হবে। হক ভাই এর নাম দিলেন গুড মর্ণিং বাংলাদেশ। আমরা আরো ঠিক করলাম সবাই যার যার বাড়ী থেকে সকালের বিভিন্ন ধরণের নাস্তা তৈরী করে আনবো । সেগুলো বিক্রি করে যা আয় হবে পুরোটাই ক্যান্সার কাউন্সিলকে বাংলাদেশ কম্যুনিটির পক্ষ থেকে দান করবো।

দিন তারিখ ঠিক হলে নির্ধারিত দিনে আমরা সাত সকালে হাজির হলাম নাস্তাসহ আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়ে। ইতিমধ্যে আমার বাসায় একটি প্রস্তুতি মিটিংও হয়ে গেছে। যাঁদেরকেই আমরা ফোন করে বলেছি তাঁরাই রাজী হয়েছেন কিছু খাবার ডোনেট করতে। নির্ধারিত দিনে সবাই এলেন । হৈ হুল্লোড়ে আনন্দে ছন্দে আমরা শেষ করলাম প্রথম গুড মর্ণিং বাংলাদেশ। শ' তিনেক ডলারের মত সংগ্রহ সেদিনের। হক ভাইয়ের হাতে তুলে

দিলাম পরবর্তীতে তিনি সেটা ক্যান্সার কাউন্সিলকে দান করে এসেছেন। এভাবেই শুরু গুড মর্ণিং বাংলাদেশের। ক্রমেই এটা আকারে বড় হলো পরবর্তীতে আরো অনেক মানুষ এতে সম্পৃক্ত হলেন। ব্লাকটাউন ছাড়িয়ে এই দাতব্য কাজটি এখন ছড়িয়ে পড়েছে লাকম্বা, ইস্টলেক, ঈঙ্গেলবার্ন, ম্যাকুয়ারী ফিল্ডসহ নানা প্রান্তরে। সব মিলিয়ে এই গুড মর্ণিং বাংলাদেশ প্রোগ্রাম এ যাবত ১৫০,০০০ ডলারের মত প্রদান করেছে ক্যান্সার কাউন্সিলকে। আর এ সুকুমার কাজটির নেপথ্যের কারিগর আমাদের হক ভাই। তাঁকে কী আর চিনিয়ে দিতে হবে? তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে আমাদের জন্য রেখে গেছেন গর্ব করার মত এ অসাধারণ একটি প্রজ্ঞা। তাঁকে কী ভোলা যাবে? না আমরা ভুলতে পারবো?

আরেকদিনের কথা। হক ভাই ফোন করে বললেন - আপনার মেয়ে মৌসুমী না এবার এইচএসসি পাশ করলো? বললাম হ্যাঁ। ভাল কথা আগামী রোববার হ্যাসলগ্রোভ কম্যুনিটি সেন্টারে মৌকে নিয়ে আপনি আর ভাবী চলে আসবেন। আমাদের ট্যালেন্ট ডে-র প্রোগ্রাম। আমরা আমাদের সব এইচএসসি এবং সিলেকটিভ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছেলেমেয়েদেরকে সম্মাননা দেবো। এর আগে কোনদিন এ অনুষ্ঠানে যাই নি যদিও এর কথা অনেকের কাছেই শুনেছি। আয়োজনটি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। নানান বক্তৃতা কথামালার পর একে একে প্রত্যেকটি ছেলে মেয়েকে মঞ্চে ডাকা হলো। তারপর তাদের বাবা-মাকে ডাকা হলো। বাবা-মায়ের হাতে একটা মেডেল তুলে দিয়ে বলা হলো এবার আপনি আপনার সন্তানের গলায় এই মেডেলটা পরিয়ে দিন।

আমি যখন মৌকে মেডেলটা পরালাম কেনো জানি আমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে গেল। তাকিয়ে দেখি কবিতাও কাঁদছে। এ কান্না যে কত আনন্দের। ধন্যবাদ হক ভাই এমন অনুভূতি জীবনে এই প্রথম। এমন অনুভূতি আপনি শত শত বাবা মাকে দিয়ে গেছেন প্রতি বছর। নিজের পকেটের ডলার খরচ করে এমন মেডেল এবং সকল অতিথিকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়ন করেছেন। এবং বছর বছর তাই করে গেছেন। আপনার মহানুভবতায়, প্রজ্ঞায় অভিভূত হয়ে সাপ্তাহিক স্বদেশবার্তায় আমার নিয়মিত কলামে লিখলাম - স্যালুট সশ্রদ্ধ স্যালুট। আপনাকে কম্যুনিটির পক্ষ থেকে আমি স্যালুট জানিয়েছি। হক ভাই - আপনি কেন চলে গেলেন। আমাদের কাওকে কিছু না বলে আপনি চলে গেলেন। লায়লা ভাবী যিনি আপনার এসব সুকুমার কাজের নীরব সহকারী তাঁকেও তো কিছু বলে গেলেন না হক ভাই। কিসের এতো অভিমান?

সেদিন আপনার ছোট ভাই আলমগীর বলছিলো - আমার ভাইয়ের নেশা হলো প্রজেক্ট। একটা শেষ হতে না হতেই আরেকটা প্রজেক্টটে হাত দিয়ে বসে। তাঁর শারিরীক অবস্থা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বহুবার বলেছি এবার একটু থামেন। তাঁকে কে থামাবে। মনে হয় সব দায়িত্বই যেন তাঁর। তাঁকেই সব করতে হবে। তবে এটাও ঠিক যেটাতেই ভাই হাত দিয়েছেন সেটা তিনি শেষ করে ছেড়েছেন। কারো জন্য বসে থাকেননি।

এবারে তাঁর নতুন প্রজেক্ট - ফ্রেন্ডশিপ ডে। তাঁর মাথায় ঢুকেছে আমরা পশ্চিমপাড়ার লোকজন একে অপরের কাছ থেকে দুরে সরে যাচ্ছি। যান্ত্রিক জীবনে সবার সাথে সব সময় দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে না। তাই বছরের একটি সময়ে বন্ধুত্ব জোরদার করার লক্ষ্যে পিকনিক ও ফ্রেন্ডশিপ ডে। এটা করতে গিয়ে তিনি একটা টেলিফোন ডিরেক্টরী তৈরী করেছেন পশ্চিম পাড়ার বাঙালিদের জন্য। সেটা এই ফ্রেন্ডশিপ ডে তে সবাইকে বিতরণ করতেন।

দু'হাজারের অলিম্পিকের সময় তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেলো বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে কিছু একটা করতে হবে। কী করে কী করে ঠিকই ব্যবস্থা করে ফেললেন। একদিন আমাকে, আবদুল্লাহ আল মামুন,উদয় শংকর বড়ুয়াসহ কয়েকজনকে ডেকে বললেন আমরা ডুন সাইড অলিম্পিক গ্রাউন্ডের সামনে অনুষ্ঠান করার অনুমতি পেয়েছি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমাদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরে একটা অনুষ্ঠান করতে হবে আমাদের বাচ্চাদেরকে দিয়ে। অনুষ্ঠানটার বর্ণণা হবে ইংরেজীতে যাতে মঞ্চে কী হচ্ছে তা যেন সবাই বুঝতে পারে। আমাকে দিলেন স্ক্রীপ্ট তৈরী করার দায়িত্ব। সে স্ক্রিপ্টের ভিত্তিতে আমরা বাচ্চাদের গান নাচ তৈরী করে পরিবেশন করালাম। অনুষ্ঠান শেষে নেপথ্যের কারিগর হক ভাই সেদিন বাংলাদেশের পতাকাটা উঁচুতে তুলে মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে বললেন আমরা সাকসেসফুল। এমন হাজারো সাকসেসের প্রস্ফুটিত ফুলটির নাম ড. আবদুল হক।

তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন বাংলাদেশীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র কম্যুনিটি সেন্টার গড়ে তোলা যেখানে মসজিদ, অডিটোরিয়ামসহ সব ধরনের সামাজিক কর্মকান্ডের ব্যবস্থা থাকবে। তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে তাঁকে যদিও তখন অনেকেই আন্ডার এস্টিমেট করেছেন কিন্তু তিনি দমবার পাত্র নন। দৌড় ঝাঁপ করে অবশেষে ড. মারুফ খান, শফিকুর রহমানসহ আরো কিছু নিবেদিত মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কোয়েকার্সহিল মসজিদটা স্থাপন করতে সফল হয়েছেন। এ মসজিদকে কেন্দ্র করে তাঁর আরো অনেক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ছিলো.. .. যাহোক যাঁরা এখন কমিটিতে আছেন তাঁদের কাছেই দায়িত্বটা হক ভাই দিয়ে গেছেন সে পরিকল্পনাগুলো পরিস্ফুটনের। মসজিদের প্রতিটি ইট মনে রাখবে হক ভাইয়ের কথা। তাঁর নিরলস পরিশ্রমের কথা।

শুধু তো মসজিদ নয় তাঁর মাথায় তখন অপর এক পরিকল্পনা। দিন দিন ক্রমশঃ বাঙালী মুসলমানের সংখ্যা বাড়ছে অথচ পশ্চিমে মুসলমানদের জন্য কোন কবরস্থান নেই। ব্লাকটাউন কাউন্সিলের সাথে দেন দরবার করে অবশেষে রিভারস্টোন সেমিটারীতে মুসলমানদের কবরের জন্য একটা জায়গা আদায় করলেন। কিন্ত জায়গাটি

বন জঙ্গলে ভরা। পরিষ্কার করতে হবে। ডাক দিলেন আমাদের অনেককেই। ড. মারুফ খান, কাজী আলী, সফির আহমেদ, ড. মাসুদুল হক, ড. হেদায়েত, ওবায়দুর রহমান পরাগ, মাসুদ খান (প্রয়াত), ইব্রাহিম মোল্লাসহ আমরা অনেকেই প্রতি উইকএন্ডে সে কবরস্থান পরিষ্কার করেছি। তারপর সেখানে মুসলমানের দাফন শুরু হলো। শুক্রবার অর্থাৎ মৃত্যুর আগেরদিন জুম্মার নামাজ শেষে অনেক মুসুল্লীর সাথে সেদিন তিনি আলাপ করেছেন রিভারস্টোনের কবরস্থান নিয়ে। বলেছেন ওখানে আর বেশী জায়গা নেই কবরের জন্য। কিছু একটা করা দরকার। তখনো কী হক ভাই জানেন পরদিনই ওই অপ্রতুল জায়গার মধ্যেই তাঁর নিজের জায়গা করে নিতে হবে? পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে প্রার্থণা হে ক্ষমাশীল সর্বশক্তিমান ঐ ছোট্ট জায়গাটিই হক ভাইয়ের জন্য বেহেস্ত করে দাও। তাঁকে ক্ষমা করো তাঁকে অধিক সম্মানিত করো (আল্লাহুমা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফুয়া ফাফুআন্নি - হে আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে পছন্দ করো অতএব তুমি ক্ষমা করো) - হক ভাইকে ক্ষমা করো। তাঁকে জান্নাতবাসি করো।

তাঁর সকল সময়ের চিন্তা কোন না কোন বিপদগ্রস্থ মানুষকে সাহায্য করতে হবে। কোথাও কোন জনসমাগম দেখলে এ কথাটা যেন তাঁর বেশী করে মনে পড়ে। বছর দুই আগে কিংসল্যাঙ্গলি স্কুলে আমার বইয়ের প্রকাশনা উৎসব করেছিলাম। হক ভাইয়ের কাঁধে অনেকটা জোর করেই ক্যাটারিংয়ের বোঝাটা চাপিয়ে দিয়েছিলাম অনন্যোপায় হয়ে। অবশেষে রাজী হলেন । বললেন আপনাকে কিছু করতে হবে না আমি খাবার হলেই নিয়ে আসবো। নিজে বয়ে সে খাবার হলে এনে দিলেন। যাহোক জনসমাগম দেখেই তাঁর মনে পড়ে গেল একজন দুস্থ অসুস্থ মানুষের কথা। আমাকে বললেন কিছু যদি না মনে করেন যখন খাবারের বিরতি হবে তখন আমি একটু

স্টেজে যাবো এক মিনিট একটু কথা বলবো। বললাম অবশ্যই বলবেন কারণ আমি তো জানি তিনি কী বলবেন। মাইক্রোফোনটা নিয়ে একজন ক্যানসারের রোগী যিনি ছাত্র এবং এ দেশে পড়তে এসেছেন তাঁর চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইলেন। হক ভাই চাইলে তো কেউ না দিয়ে পারে না। সম্ভবত শ' চারেক ডলার সেখানে তুললেন ছাত্রটির জন্য। কম্যুনিটির কোন মানুষ তিনি চেনেন অথবা না চেনেন তাঁকে তিনি হাসপাতালে দেখতে যাননি বা সাহায্য করেননি এমন ঘটনা বিরল। আমার বন্ধু লেমনকে তিনি এবং ভাবি সাতটি বছর যে সেবা যত্ন দিয়েছেন তা ভোলার নয়।

ক্যাটারিংয়ের কথা বলতে আরেকটি কথা মনে হলো সেটা না বললে অকৃতজ্ঞ থেকে যাবো। ২০০৪ সালে আমার শ্বশুর এম আর আখতার মুকুল মারা গেলেন। আমরা সেই কিংস্ল্যাঙ্গলি স্কুলেই এক শোকসভার আয়োজন করেছি। হক ভাইকে বলতেই তিনি নিজে থেকে বললেন - খাবার দাবারের কী ব্যবস্থা করেছেন। বললাম চিন্তা করছি কী করা যায়। বললাম কবিতার ইচ্ছা ও নিজে বাবার কথা স্মরণ করে কিছু রাঁধবে। জিজ্ঞেস করলেন লোক কেমন হবে। বললাম ছোট হল খুব বেশী হলে শ' দুয়েক। ভাই বললেন ঠিক আছে ভাবি যা করার করবেন বাকীটা আমি করে দেবো। ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি বললাম ভাই তাহলে কত কী

দিতে হবে অর্থাৎ রান্নার খরচ ইত্যাদি - কথাটা শেষও করতে পারিনি - বললেন ছিঃ ছিঃ এমন কথা বলবেন না। এম আর আখতার মুকুলের জন্য কিছুইতো করতে পারিনি এখন এটুকু সামান্য করার সুয়োগ পেয়েছি এটা করতে দেন। আমি চোখের পানি সংবরন করতে পারিনি। ভাইকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছি যেন আমার আত্মার আত্মীয়। মনে হলো আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে দেখতে আমি পাইনি তোমায় .. ..।

সর্বশেষ যে প্রজেক্ট নিয়ে তিনি ব্যস্ত ছিলেন সেটা হলো রিটায়ারমেন্ট ভিলেজ। তিনি ভাবতেন এই যে আমরা যারা ক্রমশঃ বার্ধক্যের দিকে ধাবিত হচ্ছি সময় আসছে যেদিন আমাদের চলা ফেরায় সীমাবদ্ধতা এসে যাবে। একাকীত্ব পেয়ে বসবে। তখন যদি আমরা সবাই একসঙ্গে কাছাকাছি থাকতে পারি তবে হয়তো আমরা ভাল থাকবো। সেজন্য তাঁর বিশাল পরিকল্পনা। ইতিমধ্যে জায়গাও খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু কাজ টা শেষ না করে নিজেই আমাদের থেকে অনেক দুরে চলে গেলেন। হঠাৎই চলে গেলেন। কাওকে কিছু বলে গেলেন না। এ কথাটা যখনই ভাবি তখনই রবীন্দ্রনাথের সেই গানটার কথা মনে হয় -

সে চলে গেলো বলে গেলো না
সে কোথায় গেল ফিরে এলো না
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল, কী যেন গেয়ে গেল
তাই আপন মনে বসে আছি কুসুম বনেতে
আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মত
সে যে ছুঁয়ে গেল ন্যুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত... ...।